তথ্যপ্রযুক্তির যুগে গ্রন্থাগার

আমিরুল আলম খান

একুশ শতকে দুনিয়ার মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি আমূল বদলে গেছে। আর এ বদলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিঃসন্দেহে ডিজিটাল প্রযুক্তির। কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস এবং উপগ্রহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এ-প্রযুক্তির সারকথা, স্বল্পতম পরিসরে বৃহত্তম ভৌতকাঠামো ধারণের সামর্থ্য ও অতি দ্রুত সেবা প্রদান। এ প্রযুক্তি পরিচালন সহজ, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য। ডিজিটাল প্রযুক্তি–এককথায় অকল্পনীয় দ্রুততায় সারা বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান, তথ্য, তথ্যবিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা নতুন জ্ঞানের সৃজন, বিকাশ, স্থানান্তর, রূপান্তর ইত্যাদি সহজ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তি জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সাধারণ, এমনকি আরণ্যক, জনবিচ্ছিন্ন মানুষের নাগালে এনে দিয়েছে। বলতে গেলে, বর্তমান বিশ্বে হেন কাজ নেই যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নেই! এ যুগের নাম এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ।

জ্ঞানের বহু প্রাচীন সংরক্ষণাগার (Repository) হিসেবে গ্রন্থাগারের বিকাশ ঘটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কয়েক হাজার বছরে যেমন বদলে গেছে বই বা গ্রন্থের সংজ্ঞা; আদল ও সংরক্ষণ-কৌশল; তেমনি বদলে গেছে গ্রন্থাগারের স্বরূপ এবং ব্যবহার-পদ্ধতিও। প্রাচীন আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক বা মিশরীয় সভ্যতায় প্যাপিরাস, মাটি বা পাথরে, কিংবা লোহা, তামা বা সোনার পাতে লিখে রাজ-অনুজ্ঞা সংরক্ষণের রীতি থেকে আজকের ডিজিটাল যুগে গুগলড্রাইভে তথ্য সংক্ষরণ ও বিতরণ (save and desimination); কিংবা চীনে কাগজ আবিষ্কার বা মুদ্রণ-কৌশল আবিষ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণে বই, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনযুগ পর্যন্ত যে-একক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা আবশ্যিক বিবেচিত হতো তার নাম গ্রন্থাগার। রাজদরবার, ধর্মালয় কিংবা বিদ্যায়তনিক গ্রন্থসম্ভার গুটিকয়েক মানুষের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে আসে গণ-গ্রন্থাগার অভিধায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো তাকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় (People's university) রূপে স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু আজকের যুগে বিশ্ব-রাজনীতি থেকে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজে যেকোনো সহায়তা পেতে মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তি যথা–বহুল কথিত সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারনেট সংযোগসহ হাতে সাম্যান্য একটা স্মার্টফোন থাকলেই সবকিছু যেকোনো মানুষের আয়ত্তাধীন এখন। গত দশকের শেষভাগে আফ্রিকার নামিবিয়া মোবাইল-ইন্টারনেট সুবিধাকে সে-দেশের শিক্ষাবিস্তারে কার্যকরভাবে ব্যবহার শুরু করে।

যুগে যুগে ব্যবহারিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা বদলেছে; জ্ঞানচর্চা ও বিনোদনকে পৃথক ভাবার দিনও শেষ হয়ে গেছে। এই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত গ্রন্থাগারের ধারণা ও চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে। ভেঙে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভ্যন্তরে তথ্যানুসন্ধানের

যাবতীয় সুবিধার ধরন। প্রশ্ন উঠেছে, এমন এক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে, না কি যুগের চাহিদা মিটিয়ে তা টিকে থাকতে পারবে?

বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগারের ইতিহাস:

সারা দুনিয়ায় ছোটো-বড় মিলিয়ে ৩,১৫,০০০ গণগ্রন্থাগার আছে বলে একটি হিসেব পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৭৩ শতাংশই আবার তথাকথিত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, যেসব দেশ দ্রুত উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর (Tomas Doherty, 2014)। তার সঙ্গে পারিবারিক ও শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার যোগ করলে সে-সংখ্যা নিঃসেন্দেহে প্রায় দ্বিগুণ, এমনকি ত্রিগুণ হতে পারে।

ব্রিটিশ পারলামেন্টে পাশ হওয়া পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট, ১৮৫০ অনুসরণে বাংলাদেশে প্রাচীনতম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় যশোরে, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে (M. H. Khan, Public Libraries in Bangladesh, Int. Libr. Rev. (1984) 16)। এরপর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল, বগুড়া ও রংপুরে আরও তিনটি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও পর্যন্ত যশোর (ইনস্টিটিউট) পাবলিক লাইব্রেরিই দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে স্বীকৃত। এখানে জ্ঞানের নানা শাখায় প্রায় ৭০ হাজার বইসহ রয়েছে বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সংবাদপত্র ইত্যাদি। লাইব্রেরি-সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ১৯৭০ দশকের শেষভাগে এখানে খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক গ্রন্থসঞ্চালনকেন্দ্র 'বই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (খান, আমিরুল আলম, ১৯৮৬)। কিন্তু প্রায় শতখানেক শাখা খুলেও এক দশকের বেশি তা চালু রাখা সম্ভব হয় নি।

কেমন চলছে এসব গণগ্রন্থাগার:

পাবনায় 'অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি' স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের বিপুল অর্থ-সহায়তায় যে ভবন, পুস্তক ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা লাভ করেছে তার ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে–শুধু চাকরিপ্রার্থীদের চাকরির বিজ্ঞাপন খোঁজার কাজে। এমনকি রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারেও ভোর থেকে লম্বা লাইনে ভিড় জমায় চাকরিপ্রার্থীরাই বেশি (সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২ মে ২০১৭)। আর বিখ্যাত 'কুমিল্লা রামমালা পাবলিক লাইব্রেরি' বিপুলসংখ্যক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ভার বহনের সামর্থ্য হারাচ্ছে মালিকানা বিষয়ক মামলায় জড়িয়ে! বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির পুরোনো জৌলুস নেই; খুলনা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠকসংখ্যা কমেই চলেছে। দেশের অন্যতম প্রাচীন 'রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি' আমলাতন্ত্রের নিকৃষ্টতম সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে একপাশে তার পুরোনো গৌরব ও ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই করছে, অন্যদিকে সরকারের ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বন্দ্বে অর্থের শ্রাদ্ধসহ ধ্বংসোন্মুখ! কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি অভিভাবকহীন! নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মাননা প্রদান এবং নৈমিত্তিক কার্যক্রমে এখনও সচল 'নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগার'; যদিও কালের যাত্রার ধ্বনি সেখানে ঝংকৃত নয়। গোপালগঞ্জের মুকসুদপর উপজেলায় 'বাঁশবাড়িয়া আহম্মদ আলী পারিবারিক লাইব্রেরি'টি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়

গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ফজলে রাব্বি সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টায় বিপুল মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ সত্ত্বেও স্থানীয় শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের সেভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত নড়াইল জেলার 'লোহাগড়া রামনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি'ও আর আগের মতো পাঠক আকর্ষণ করে না। লেখকের সরেজমিন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি লাইব্রেরির বর্তমান দশা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থাগার:

আলোকিত মানুষ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' সারা দেশে গ্রন্থপাঠ আন্দোলন করে চলেছেন। বিশ্বের নির্বাচিত চিরায়ত গ্রন্থপাঠের এ মহৎ আয়োজনে এই প্রতিষ্ঠান ঢাকায় মূল কেন্দ্রের বাইরে ঢাকা জেলাসহ সারা দেশে ৫৬টি জেলায়, ২৫০ উপজেলায় মোট ১৮০০ লোকালয়ে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (আলোর পাঠশালা) পরিচালনা করে থাকে (দ্রঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ওয়েবসাইট)।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে যশোরের 'ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরি' দেশে ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি-লাইব্রেরি হিসেবে তৃণমূলে লাইব্রেরি-সেবা পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে লাইব্রেরির প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চালায়। গ্রামীণ জনপদে যেখানে মানুষ সভ্যতার আলোবঞ্চিত–সেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে, উচ্চতর স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থঋণ দিয়ে, এবং প্রান্তিক জনসাধারণের নৈমিত্তিক চাহিদা পূরণে যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্রব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করে ১৯৯০ দশকেই এই লাইব্রেরি দেশে-বিদেশে সুনাম ও ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের 'ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ইশতাহার' মেনে 'ডিহি ইউয়িন পাবলিক লাইব্রেরি' প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের একটি বাংলাদেশি মডেল তৈরি করার। কিন্তু একুশ শতকের প্রবল ডিজিটাল-প্লাবনে এই প্রতিষ্ঠানও পাল্লা দিতে পারছে না।

নিবেদিতপ্রাণ দুই বইপ্রেমী:

বাংলাদেশে জনগণের কাছে গ্রন্থসেবা পৌঁছ দিতে নিরন্তর প্রয়াসী দুজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের কথা উল্লেখ করতে আমরা যেন কখনও ভুল না করি। একক প্রচেষ্টায় এমন নজির সত্যিই বিরল। নিজের টাকায় রাজশাহীর ২০টি গ্রামে বইয়ের আলো পৌঁছে দিয়ে সবার মন জয় করেছেন 'পলান সরকার'। তিনি এদেশে এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যটি ঝিনাইদহ জেলায় 'মাতৃভাষা লাইব্রেরি'। এক নিবেদিতপ্রাণ যুবক 'এম আর টুটুল' একক প্রচেষ্টায় লাইব্রেরি আন্দোলনকে এক নতুন উচ্চতায় স্থাপন করেছেন। এমন বইপাগল মানুষ এদেশে আরও আছেন। আমাদের উচিত তাঁদের খুঁজে বের করে সম্মানিত করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা:

পাঠক এবং গ্রন্থাগারে সরাসরি বই পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ। একসময় সারা বছর দেশের কোথাও না কোথাও বইমেলার আয়োজন করত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। এখন সেখানেও ভাটার টান। খবর নিয়ে জানা গেছে, গত বছর এই প্রতিষ্ঠান সারা দেশে ১৬টি বইমেলা করতে পেরেছে। আর ওসমানী উদ্যানের রেলের জমি থেকে গ্রন্থকেন্দ্রের পঞ্চম তলায় স্থান পেয়েছে মহানগর পাঠাগার।

গণগ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর কাজ। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড হলেও এখানে জনসংখ্যা ১৬ কোটির ওপর। বর্তমান বিশ্বে '১১টি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ'-এর একটি আমাদের বাংলাদেশ। বিপুল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত দেশে সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র ৭৩! অর্থাৎ গড়ে ২২ লাখ মানুষের জন্য মাত্র একটি গণগ্রন্থাগার আছে (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ যে-তালিকা তৈরি করেছে সেই মোতাবেক দেশে মোট বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা হাজার দেড়েক। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সমিতির তালিকা অনুযায়ী দেশে সরকারি পাবলিক লাইব্রেরি ৭০, বেসরকারি ১৯৫৬। ঢাকা শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩২টি ছোটো-বড় লাইব্রেরি আছে যেগুলি সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে (ছিদ্দিক, আশরাফুল আলম ২০১৭)। তবে এই সব পরিসংখ্যানই অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক' সারাদেশে ২,৬৫০টি 'গণকেন্দ্র' গ্রন্থাগার পরিচালনা করে (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। স্কুল-কলেজে এখন আগের মতো গ্রন্থাগার নেই, থাকলেও সচল নয়। নোট-গাইডনির্ভর লেখাপড়ার দৌরাত্ম্যে শিক্ষার্থীদের এখন কোচিং সেন্টারে ছুটতে ছুটতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। গ্রন্থাগারের চৌকাঠে পা রাখবে কখন?

কাণ্ডারিবিহীন নৌকা:

বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরি অনেকটা কাণ্ডারিবিহীন নৌকার মতো। কখনও তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কখনও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কখনো-বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ পাবলিক লাইব্রেরির কাণ্ডারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় জাতীয় বাজেটের এক শতাংশ বরাদ্দও লাভ করে না। অবশ্য আমাদের শিক্ষাখাতও ইউনেস্কো-স্বীকৃত মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ছয় শতাংশ দূরে থাক, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত চার শতাংশের অর্ধেক, অর্থাৎ দুই শতাংশের বেশি বরাদ্দ লাভ করে নি। এবং জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের সর্বমান্য মানদণ্ড থাকলেও বাংলাদেশে তা কখনও ১২ শতাংশ অতিক্রম করে নি। লাইব্রেরি-উন্নয়নে বাজেট না হয় অনুল্লেখিতই রইল!

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্তে গড়ে তোলা উপজেলা ব্যবস্থায় প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে 'উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয় মধ্য-আশির দশকে। বলা

বাহুল্য, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তারও আগে, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ লাইব্রেরি কনসালটেন্ট 'জেমস পারকার' বাংলাদেশে ইউনিয়ভিত্তিক পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন (পারকার রিপোর্ট, ১৯৮৭)। আর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার' গড়ে তোলার আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক ও শিক্ষা-আন্দোলনের মতই জনপ্রিয় শ্লোগান। হয়ত সেকথা স্মরণ করেই প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি, আর হাসপাতালের চেয়ে একটু কম" প্রয়োজন বলেই গণ্য করেছিলেন। বলা বাহুল্য, 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার' আন্দোলন যত আবেদন ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালের কোনো পদক্ষেপই তত সফল হয় নি। বাংলাদেশে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত, এমনকি সরকারি পাবলিক লাইব্রেরিতেও পেশাদার, ডিগ্রিধারী লাইব্রেরিয়ান নিয়োগদান সম্ভব ছিল না! এখনও বাংলাদেশে পেশাদার উপযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের সংকট কাটে নি।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি এবং ইউএস ইনফরমেশন সার্ভিস লাইব্রেরি (United States Information Service) এককালে খুবই কার্যকর সংগঠন ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত হলেও বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি–যেটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়–আগের মতো পাঠক আকৃষ্ট করতে পারছে না (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির অভিজ্ঞতার আলোকে ডোহার্থিও স্বীকার করেন যে, লাইব্রেরিগুলো আগের মতো পাঠক টানতে পারছে না। এর মূল কারণ, তাঁর মতে, প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ পাঠকদের পাঠাভ্যাসের ধরন বদলে দিয়েছে। তিনি লিখছেন:–

"Today, public libraries are at a turning point. The way we access and consume information has changed dramatically in the 21st century, and this presents major challenges and opportunities for public library systems across the world… The advent of new technologies has changed some of our reading habits."

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা:

কিন্তু শুধু যে বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরি আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে তাই নয়, বরং বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন অর্থাৎ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় কী এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে উন্নত বিশ্বে। ভিভিয়েন ওয়ালার তার গবেষণায় (Legitimacy for large public libraries in the digital age) এসব বিষয় খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন। একটু পিছনে ফিরে দেখি। এখন থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে এম হ্যারিস লক্ষ করেন–আরও ১০০ বছর পূর্বে লাইব্রেরিকে প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছিল।। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা হ্যারিসের বক্তব্যটি একটু দেখে নিতে পারি:

"The very existence of the public library appears in jeopardy; public librarians appear both concerned and confused. They find themselves asking, as did their predecessors over 100 years ago, what is the purpose of the public library?"

তিনি যা বলছেন তার সারকথা, সর্বযুগেই যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে হয়। কিন্তু বহু দেশে যেসব সমস্যা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, তার মধ্যে অন্যতম হলো লাইব্রেরি-ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী অর্থাৎ ডিজিটাল করা।

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেট লাইব্রেরির নতুন বিশাল ভবন দেখে ভাববেন না, এখানে সময় বাক্সবন্দী হয়ে আছে। নিচতলাতেই পাঠক বা ব্যবহারকারী ছাত্রদের জন্য এক-একটা কম্পিউটারে পড়াশোনার চমৎকার ব্যবস্থা, আরেকটি কক্ষে শিশুরা মনের আনন্দে ভিডিও-গেমও খেলতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়া লাইব্রেরির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেইজিংয়ে চীনের সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরিকে যতদূর সম্ভব পরিবর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থশালার নতুন ভবনেও এসব ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রয়োজন উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর সাহস:

এই উদ্বেগ ও বিমূঢ়তার কারণ, লাইব্রেরির সনাতন যে ধারণা আমাদের মনে গোপনে বসবাস করে, তার সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে একটি ভবন, সারিবদ্ধ বইয়ের তাক আর চেয়ার-টেবিলে বসা পাঠকসম্প্রদায় যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কিন্তু ডিজিটাল যুগে ভার্চুয়াল লাইব্রেরিতে এই পরিকাঠামো প্রায় অকার্যকর। ছোট্ট একটি মেমোরিকার্ড যে-পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে তা হয়তো সনাতন পদ্ধতিতে বিপুল ব্যয়সাধ্য একটি ভবনে সংরক্ষিত সমুদয় তথ্যের সমান। সেটি একটি নোটপ্যাড বা মোবাইল ফোনে ঢুকিয়ে ইন্টারনেট থেকে রাজ্যের অজানা তথ্য সেখানে ডাউনলোড করা সম্ভব। আগে যেখানে লাইব্রেরি-ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হতো ডজনখানেক লোক, সেই কাজও সহজে সম্পাদন করতে পারেন মাত্র একজন দক্ষ কর্মী! কেবল চেতনাগত পরিবর্তন, উদ্যম এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে পুঁজি করে ডিজিটাল যুগে আরও কার্যকর লাইব্রেরি গড়ে বিশ্বব্যাপী তার সেবা বিস্তৃত করা সম্ভব! সবচেয়ে বড় কথা, এজন্য একজন উদ্ভাবনীক্ষমতাসম্পন্ন লাইব্রেরিয়ান হয়তো একপ্রস্থ পুস্তকের বস্তুগত ক্রয়ও নিষ্প্রয়োজন ভাবতে পারেন!

ভাবুন একবার, 'আমাজন ডট কম' সারা দুনিয়ায় বই পৌঁছে দিচ্ছে অনলাইনে! এদেশেও 'রকমারি ডট কম' বা 'পড়ুয়া' পাঠকের হাতে বই পৌঁছে দিচ্ছে। একটিও গাড়ির মালিক না হয়ে শুধু উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে পুঁজি করে 'উবার' সারা বিশ্বে অ্যাপভিত্তিক ভাড়ার ট্যাক্সির কেমন রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে! আর বাংলাদেশের বাস-ট্রেনের টিকিট বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান 'সহজ ডট কম'-এ এখন দেড় কোটি ডলার লগ্নি করতে এগিয়ে আসছে চীনা আর সিঙ্গাপুরের নামকরা গোল্ডেনগেট নামের করপোরেট প্রতিষ্ঠান! তাহলে, অর্থও এখন সমস্যা নয়, যদি মাথায় বুদ্ধি থাকে!

কিন্তু আইনি জটিলতা কিছু থেকেই যাচ্ছে। উবার বা সহজ নাহয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, লগ্নিকরা টাকা তারা তুলে নেবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরি তো সরকারের সেবাপ্রদায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেই ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তারও পূর্ব থেকেই মার্কিন মুলুকেও পাবলিক লাইব্রেরির সেবা মুনাফাহীন।

ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল লাইব্রেরি:

কিন্তু কথা শুধু সেটাই নয়। কথা হলো, আজকের ডিজিটাল যুগে একজন পাঠককে লাইব্রেরি ভবন পর্যন্ত যেতে হবে কেন? যেখানে একটা ইন্টারনেট সংযুক্ত স্মার্টফোনেই জগতের তাবৎ তথ্য মেলে, সেখানে এ বিড়ম্বনা সইবে কেন পাঠক? যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা বলছে, যখন ঘরে বসেই মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক আধুনিক জীবনযাপনের অতি জরুরি যাবতীয় সেবা পাচ্ছে, তখন সনাতন লাইব্রেরিকে অর্থায়ন করা অর্থহীন; বিশেষ করে, একদিকে যখন লাইব্রেরিগুলোর পরিচালনা ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে পাঠকসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। জনগণের করের ওপর এই চাপ কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে? এ বিতর্কের জবাব খুঁজতে গিয়ে তারা বারবার 'কমিউনিটি' অর্থাৎ নাগরিক বা স্থানীয় জনগণকে সংশ্লিষ্ট করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। 'আর্ট কাউন্সিল ইংল্যান্ড' এক ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা (Envisioning the library of the future) চালিয়ে মতামত দেয়–

"The 21st century public library service will be one in which ælocal people are more active and involved in its design and delivery."

ক্যালিফোর্নিয়া পলিটেকনিক্যাল স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক রিবল যেমন মনে করেন–

"The demand for library services is slowly moving from print media to digital, but the relevance of libraries in the digital age lies in their ability to offer everyone access to all forms of media."

না, প্রিন্টমিডিয়া এখন অনেক বেশি দ্রুত ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশ করছে। তাই তিনি যেসকল ধরনের মিডিয়ায় সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আজকের পৃথিবীতে যেমন মুদ্রিত সামগ্রীর জায়গা দখল করছে ভার্চুয়াল প্রযুক্তি, আগামি দিনে নতুন নতুন প্রযুক্তি এই ভার্চুয়াল বিশ্বকেও 'সেকেলে' ঘোষণা করবে।

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল:

মানুষ অমৃতের সন্তান। রবীন্দ্রনাথ যেমন "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল", "মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ার" উল্লেখ করেছেন–তা এখন ভার্চুয়াল জগতে মুক্তিলাভ করেছে। দিব্যধামে বসবাসরত অমৃতের পুত্রদের জন্য এখন অমৃতলোকের প্রথম আবিষ্কর্তা মহাপুরুষদের কণ্ঠও ভার্চুয়াল লাইব্রেরিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! কালের সে যাত্রার ধ্বনি শ্রবণে উৎকর্ণ যে-কেউ তা শ্রবণ

করবে।

মার্কিন মুলুকে এ শতকের গোড়ার দিকেই Internet2 K20 প্রকল্প ১০০ 'জিবিপিএস' গতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সংযোগ দিয়ে এ ধরনের সুবিধা দেওয়া শুরু করে। ভারতের কেরালা রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্যাটেলাইট সুবিধায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় রাজ্যব্যাপী শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা:

বাংলাদেশ সরকার এটুআই (A2I) প্রকল্পাধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে "ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র" (Union Information Service Centres (UISCs) স্থাপনের মাধ্যমে ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল-সেবা পৌঁছে দিয়েছে। এই সেবাকেন্দ্রগুলি দেশের মানুষের তথ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপরিমেয় সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এখন তাকে ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্কের অধীনে আনার কাজ শুরু হয়েছে। তাই এখন ভাবতে হবে–সেগুলি কত বিচিত্র ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। সেটি সম্ভব আরও এ কারণে যে, ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি মানুষই এখন মোবাইল ফোন সুবিধা ভোগ করে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অভিজ্ঞতা:

এক্ষেত্রে আমরা যশোর শিক্ষা বোর্ডের অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখতে পারি। খুলনা বিভাগের ১০ জেলা নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড কাজ করে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কুল, কলেজ এই শিক্ষা-বোর্ডের অধীন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই বোর্ড নিজস্ব অর্থায়নে তাদের সকল স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি করে। গুগলকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বইয়ের অনলাইন ক্যাটালগিং কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করে যশোর বোর্ড। সকল তথ্য যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে জমা হয়। ডাটা-নিরাপত্তার জন্য বোর্ড বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারও ব্যবহার করে। এ কাজে আইসিটি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের 'এটুআই' প্রকল্প সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। উল্লেখ্য, গুগল 'ডিউই দশমিক বর্গীকরণ' এবং 'সিয়ার্স লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংস' বিনামূল্যে ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে থাকে। সেবা-ব্যবস্থা আরও একটু উন্নত করা গেলে এই বোর্ড তার অধীনে থাকা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত বইয়ের তথ্য এবং বইপত্র সহজে আদান-প্রদান করতে সক্ষম হবে। (খান, আমিরুল আলম, ২০১৪)!

এখন কল্পনা করুন, কোনো প্রতিষ্ঠান সংগৃহীত বইয়ের ই-সংস্করণ প্রকাশ করলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা লাইব্রেরিসেবা কত সহজে সকল শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে:

যুগ বদলের সঙ্গে লাইব্রেরির ধারণা ও কাঠামোগত পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু, একথা নিশ্চিত করে উচ্চারণ করা যায়, যত দিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে, তত দিন লাইব্রেরির উপযোগিতা ফুরাবে না; তবে তার রূপান্তর ঘটবে। লাইব্রেরি হলো সভ্যতার মাপকাঠি। রসের সাগরে স্নান করিয়ে ওমর খৈয়াম যেমনটি বলেছিলেন–তার জুড়ি তামাম দুনিয়ায় নেই–"রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে, কিন্তু অনন্তযৌবনা বইটি ফুরাবে না, যদি তেমন বই হয়!" কিন্তু খৈয়ামও বলেন নি, বইটি তালপাতায়, না কি ভূর্জপত্রে, প্যাপিরাসে, দামী কাগজে, দামী রেশমবস্ত্রে লিখিত, না কি স্বর্ণপত্রে উৎকীর্ণ!

তা এ যুগের তরুণ প্রজন্ম কেন কাগজের পাতায় কালো অক্ষরে ছাপা বই নিয়ে মাথা ঘামাবে? তারা পড়বে ভার্চুয়াল বই, আর পড়বেও ভার্চুয়াল মাধ্যম অর্থাৎ ডিজিটাল ফরমেটে। হাতে থাকা একটা স্মার্টফোন, কিংবা অনাগত যুগে উদ্ভাবিত নতুন কোনো ডিভাইস সে ব্যবহার করবে পরম দক্ষতায়। আমাদের কালের রুচি দিয়ে তো আগামী প্রজন্ম চলবে না। যৌবনের ধর্ম নয় সেটা। তাই 'লাইব্রেরিকক্ষে পাঠকের দেখা মিলছে না' বলে আহাজারি করার কিছু নেই। বরং আসুন, আমরাও স্মার্ট হই, ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তুলি।

ডোহার্থির কথা ধার করে বলি, "to survive in the digital age and stay relevant, public libraries need to be brave and innovative. They must embrace both the physical and virtual." সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে, নতুন-পুরাতনের সমন্বয় ঘটিয়েই সকল যুগে সব সংকট মোকাবেলা করতে হয়। আর সেটা করতে নির্ভর করতে হয় কমিউনিটি তথা জনগণের সম্মিলিত সক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সামর্থ্যের যূথবন্ধন ঘটিয়ে। যখন রাষ্ট্র এবং জনগণ একাত্ম হয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, তখন কোনো কাজই অসাধ্য থাকে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল লাইব্রেরির বিকল্প নেই।

করণীয়:

দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতা যদি বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরিখাতে কাজে লাগানো যায়, তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের ই-সংস্করণ করে তা সত্যি সত্যিই নানা বয়সী পাঠকের স্মার্টফোনের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক তার জন্মসনদ অথবা নাগরিক পরিচয়পত্র ব্যবহার করে (অর্থাৎ নাগরিক আইডি নম্বর) বিনা পয়সায়, কিংবা শহর-গ্রাম, লিঙ্গ ও বয়সভেদে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'ফি' দিয়ে তথ্য জানার সুযোগ পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রমশ ভবনকেন্দ্রিক লাইব্রেরির ধারণা বদলে গিয়ে এবং ভার্চুয়াল লাইব্রেরির ধারণা পরিপোষণ পেলে ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে।

রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে তেমন একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেই এই নিবন্ধকারের ধারণা। আর সেটা করা গেলে সনাতন ও ভার্চুয়াল লাইব্রেরির সমন্বয়

সাধন যেমন সম্ভব, তেমনি এ দেশেও লাইব্রেরি খাতে যুগোপযোগী প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব। এজন্য বর্তমানে লাইব্রেরি পরিচালনায় যে জাতীয় ব্যয়, তাও অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। একবার একটি ন্যাশনাল ডিজিটাল ব্যাকবোন তৈরি করা গেলে সেটি আমাদের বহুমাত্রিক সুবিধা প্রদান করবে।

সতর্কতা:

তবে সকল সুফল-প্রদায়ী কর্মযজ্ঞেরই কিছু না কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডিজিটালাইজেশনের সবচেয়ে বড় সংকট ডিজিটাল ডিভাইড। সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির বদলে এই প্রযুক্তি বিশ্বকে এমন ভয়াবহরূপে বিভক্ত করে ফেলছে যে, সতর্ক না হলে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য পর্বতপ্রমাণ হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Khan, M. H. (1984), Public Libraries in Bangladesh, Int. Libr. Rev. (1984) 16
2. Doherty, T. (2014), Why do we still need public libraries in the digital age? britishcouncil.org/voices
3. Waller, V. (2008), Legitimacy for large public libraries in the digital age. LIBRARY REVIEW, Vol. 57 Issue 5
4. Harris, M. (1973), "The purpose of the American public library: a revisionist interpretation of history", in Totterdell, B. (Ed.), Public Library Purpose: A Reader, Linnet Books, London.
5. Rible, H,(2011) Why Libraries are Relevant in the Digital Age, https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi? article =1000&context=cesp

১. খান, আমিরুল আলম (১৯৮৬), স্বরবর্ণ, যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি জার্নাল

২. খান, আমিরুল আলম (২০১৪), বইয়ের আনন্দভুবনে ফেরার বাসনায়, *প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৪

৩. ছিদ্দিক, আশরাফুল আলম (২০১৮), বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরির তালিকা

৪. পারকার রিপোর্ট, ১৯৮৭